অস্ট্রেলীয় বীর প্রতীক ডব্লিউএএস ওডারল্যান্ড

ARq `vk¸ß

ডারল্যান্ডের স্মৃতি মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে চির উজ্জ্বল। স্মৃতি বললাম এ কারণে, তিনি এখন আর সচল, প্রবাহমান নন। বার্ধক্যের ভারে নুয়েপড়া, অসুস্থতা ও ক্লান্তিতে শয্যাশায়ী। এ ডিসেম্বরে ৮৩ বছরে পা দিলেন ওডারল্যান্ড। পার্থের হাসপাতালে প্রায়ান্ধ এই মুক্তিযোদ্ধার হৃদয়ে আজও বাংলাদেশ চিরঞ্জীব। আমাদের সময়কালে শ্রেষ্ঠ ও গৌরবময় ইতিহাসের এক অনিবার্য সঙ্গী ডব্লিউএএস ওডারল্যান্ড ভীষ্মের শরশয্যায়। তার জীবনের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে রৌদ্রমুখরিত একাত্তর, বাংলাদেশ ও যুদ্ধজয়ে জন্মের অহঙ্কার।

কিছুদিন পূর্বে কথা বলি তার স্ত্রী মারিয়ার সঙ্গে। সিডনির সঙ্গে সময়ের ব্যবধানে তিন ঘণ্টা পশ্চিমে থাকেন তারা। অস্ট্রেলিয়া বস্তুত এক মহাদেশ। ফলে মানচিত্রে দেখা যাবে পার্থ হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া ও ব্যাংকক তথা থাইল্যান্ড সংলগ্ন। এ শহরে মৃত্যুশয্যায় শায়িত ওডারল্যান্ডের সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি বাঙালি ও বাংলাদেশের একান্ত স্বজন, এই মিত্রতা, বন্ধুত্ব কোনো কথার কথা নয়, রক্তের মূল্যে কেনা। ওডারল্যান্ড নিজে যুদ্ধ পরিচালনা, সংগঠন, এর পাশাপাশি অংশগ্রহণ করে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে উঠেছিলেন।

মারিয়ার বিষণ্ণ কণ্ঠে ভেসে আসে উত্তাপ। স্বামী গর্বে গর্বিতা তার স্মৃতিতে বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে, বিশেষত ১৬ ডিসেম্বর এখন জ্বলজ্বলে। আমার কণ্ঠস্বর শুনে গোড়াতে একটু বিচলিত হলেও ক্রমে তিনি কথা বলতে শুরু করেন। পর্যায়ক্রমে জানান, বিশেষ ওই দিনটা যে আমরা কখনোই ভুলতে পারব না, সে কথাটা অডারল্যান্ড প্রতি বছর ওর বন্ধু, কন্যা আর প্রিয় মানুষদের জানাতে ভোলে না। হবে নাই বা কেন তিনি শুধু বাঙালির সংগ্রাম দেখে তৃপ্ত ছিলেন না, অংশ নিয়ে জীবন বাজি রেখে লড়াই করেছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক জিয়াউর রহমান, শফিউল্লাহ প্রমুখের সঙ্গে সরাসারি যোগাযোগও ছিল তার।

ওডারল্যান্ড কথা বলতে চান, অজস্র স্মৃতির ভেতর থেকে তুলে আনতে চান ঢাকা, টঙ্গী, যুদ্ধাক্রান্ত পূর্ববাংলার স্মৃতি। মনে তার গভীর বেদনা, মারিয়া বলেন, ও এ বিষয়ে লেখার কথা ভেবেছিল, কিন্তু এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। সত্যি তাই, সময়ের স্রোতে ভেসে যাওয়া ২৯ বছরের স্মৃতির গ্রন্থনা মারিয়ার জন্য কষ্টসাধ্যই বটে। জীবদ্দশায় ডব্লিউএএস ওডারল্যান্ড তা করে যেতে পারলে আমাদের জন্য সহজতর হতো ইতিহাস। তবে ক্ষুদ্রাকারের কিছু চিঠিপত্র, অনুসন্ধিৎসু পাঠক, স্রোতাদের জন্য লেখা সময় সময় চিরকুট থেকে অনেক অজানা তথ্য পাওয়া যায়। ওডারল্যান্ড এমনি এক চিঠিতে লিখছেন, 'আমার জন্ম ১৯১৭ সালের ডিসেম্বরে, আমস্টারডামে। ইয়োরোপ তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তৃতীয় বছরে। ১৯৩৬-এ আমি ন্যাশনাল সার্ভিসে যেতে বাধ্য হই। এর কিছুদিন পর বাটা শু কম্পানিতে আমার চাকরি হয়।' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তাল দিনগুলোতে যুবক ওডারল্যান্ড ডাচ বাহিনীর পক্ষে লড়াই করতে গিয়ে নাৎসি বর্বরতার সম্মুখীন হন। তার ভাষ্যমতে সামান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ফুৎকারে উড়ে যাওয়া ডাচদের সঙ্গে এক হপ্তান্তে বেলজিয়াম ফ্রান্সকেও নাৎসিরা কব্জা করে নেয়। চতুর ও কৌশলী ওডারল্যান্ড পাউ ক্যাম্প থেকে ছাড়া পাওয়ার পর দমে না গিয়ে যুক্ত হন আন্ডারগ্রাউন্ড তৎপরতায়। তিনি লিখছেন, 'জার্মান আর বিভিন্ন ডাচ উপভাষায় আমি অনর্গল কথা বলতে পারতাম। জার্মান হাই কমান্ডের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে যায়। ফলে ডাচ আন্ডারগ্রাউন্ড তৎপরতাকে যেমন আমি সাহায্য করতে পেরেছিলাম, তেমনই জরুরি তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করতে পেরেছিলাম মিত্রবাহিনীকে। ১৯৭১-এর মার্চে ঢাকায় পাকিস্তানি ট্যাংক নামার পরও একই ব্যাপার হয়েছিল।'

শুধু কি তাই? তার চোখে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বেদনা, রক্তাক্ত স্মৃতি ও বাংলার মুক্তিযুদ্ধ এতটা একাকার হয়ে পড়েছিল যে, তিনি উদ্বুদ্ধ হন জড়িয়ে পড়তে। নিজেই স্বীকারোক্তি দিচ্ছেন, 'আমার ইয়োরোপের যৌবনের অভিজ্ঞতাগুলো আমি ফিরে পেয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, যা কিছু ঘটছে বিশ্ববাসীকে কারো সেসব জানানো উচিত। আমি চলাফেরা করতে পারছিলাম অবাধেই। নিরীহ মানুষজনের ওপর পাকিস্তানিরা যেসব ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছিল ছবিও তুলতে পারছিলাম সেসবের। তারপর সে ছবিগুলো পাঠিয়ে দিতে পেরেছিলাম বিদেশী তথ্যমাধ্যমে।'

এটুকু থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, কী গভীর অনুভূতি ছিল তার। সে আবেগ, সে চেতনাবোধ ওডারল্যান্ডকে ধীরে ধীরে গ্লানিত করতে শুরু করে। টঙ্গীর বাটায় কর্মরত এ ডাচ ভদ্রলোক আবারও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান। তাকে হানাদার বাহিনীর উচ্চ স্তরের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগের পরিধিকে তিনি গোপনে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের কাজে লাগাতে থাকলেন। বাটা টঙ্গীসহ সেক্টর ১ ও ২ নম্বরে গড়ে তুললেন গেরিলা বাহিনী। স্বয়ং প্রশিক্ষক হলেন ওডারল্যান্ড। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মৃত্যু ও লাঞ্ছনার ভয়কে তুচ্ছ করা এ বীরসেনানীর মতে, 'বাঙালিদের জন্য যে গভীর ভালোবাসা আর টান আমি অনুভব করেছি এ ছিল তারই বহিপ্রকাশ।'

cvK‡mbv‡`i wkKvi wekw`¨vj‡qi Qv·iv, 26 gvP© 1971
Qwe : WweDGGm I‡Wvij¨vÛ

তার স্ত্রী মারিয়াকে কথা বলার সময় প্রায়শই ব্যথিত মনে হচ্ছিল। গভীরের কারণ অনুসন্ধান এতদূর থেকে সম্ভব নয় জেনেও প্রশ্ন করি। মারিয়া জানায়, শেষ বয়সেও ওডারল্যান্ড বাংলাদেশের ভাবনায় আকুল। তার অস্থির চিত্ত বিক্ষুব্ধ মনে স্বাধীনতার যুদ্ধের সঙ্গে কিছু দায়িত্ববোধও কাজ করে। যে কারণে ক্ষীণদৃষ্টি শক্তির পরও যখনই বাংলাদেরে কিছু পেলেও মেলে ধরতে ব্যাকুল থাকেন। আমাদের দেশে সংঘটিত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড এমনকি সরকার পরিবর্তনসহ রাজনৈতিক সামাজিক অসন্তোষে বিক্ষুব্ধ হন তিনি। কল্যাণের প্রশ্নে প্রায়শই অনেক মতামত, বক্তব্য আর কথা বলতে উদ্যোগী হন। মারিয়া জানায়, 'বয়সের এ পর্যায়ে তা সত্যি সত্যি আর সম্ভব নয়।' এমনকি হওয়ারই কথা। মুক্তিযুদ্ধকে তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন, লড়াই করেছেন, যার কাছে মুক্তিযোদ্ধারা 'নিজ সন্তানের মতো'। তার জন্য তো এটাই স্বাভাবিক।

†invB cvqmb A‡eva wk'ïivI, Qwe : WweDGGm I‡Wvij¨vÛ

মুক্তিযুদ্ধে অপরিসীম অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ওডারল্যান্ড বীরপ্রতীক খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। আমাদের জানামতে তিনিই একমাত্র বিদেশী যিনি এতবড় পদবিতে অভিষিক্ত। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, ডাচ-অস্ট্রেলিয়ান বীরপ্রতীক ওডারল্যান্ডকে সিডনি তথা অস্ট্রেলিয়ার বাঙালিরা চেনেন না। দোষটা তাদের নয়। ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ, জামায়াত শিবিরের রাজনৈতিক চেতনার স্মৃতিবাহী প্রবাসীদের জন্য তিনি অগুরুত্বপূর্ণ হতেই পারেন, কিন্তু বঙ্গবন্ধু পরিষদ, জিয়া পরিষদ স্বাধীনতার পক্ষশক্তি নামে পরিচিত অজস্র সংগঠনের কেউ তাকে কোনো দিন সংবর্ধনা জানাতে ডেকে আনেন না। শারীরিক কারণে দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী ওডারল্যান্ডকে গিয়ে সংবর্ধনা জানিয়েছেন এমনটি শোনা যায় না। অধিকন্তু শুনেছি বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তারাও তার সম্পর্কে অজ্ঞ, উদাসীন। সাবেক রাষ্ট্রদূত মুক্তিযোদ্ধা মঈনুল হোসেনের সময়কালে যোগাযোগ থাকলেও এখন তা অনুসন্ধানে এদের আগ্রহ নেই। যদি থাকেও তার কোনো প্রমাণ মেলা দুষ্কর।

এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। দরিদ্র বাংলাদেশের বিক্ষুব্ধ রাজনীতি, সমাজ ও মানসিকতা আমাদের জীবন থেকে প্রায় সব চেতনাই কেড়ে নিয়েছে। ফলে কে আর মনে রাখে ওডারল্যান্ডকে? অথচ অকুতোভয় এই বীর মুক্তিযোদ্ধা একাত্তরে আমাদের হয়ে শুধু যুদ্ধ করেননি, এখনো তার পরিচয়ে সে স্মৃতি বহন করে চলেছেন। তার প্যাডে দেখেছি ডব্লিউএএস ওডারল্যান্ড বি. পি. লেখা। এই যে বীরপ্রতীক খেতাবটি, নিজের নামের সঙ্গে তার সংযুক্তি বজায় রেখে 'তিনি আমাদের লোক' এই পরিচয় তুলে ধরেছেন আজীবন। মারিয়াও একমাত্র কন্যাকে ওডারল্যান্ড বলে থাকেন, 'বাংলাদেশ আমাদের ভালোবাসা, পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি আবেগের এ ধারাটা অব্যাহত রেখো।' অথচ আমরা তাকে অবলীলায় ভুলতে পেরেছি। বাংলাদেশের কোনো পাঠ্যপুস্তকে তার কথা উল্লেখ আছে বলে শুনিনি। স্বাধীনতা বিজয় দিবস এমন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দিবসগুলোতে সরকারপ্রধানরা তাকে মনে করেন কিনা তারও কোনো প্রমাণ দেখিনি। জাতীয় বীরের তালিকায় ওডারল্যান্ডের নাম রয়েছে কিনা এ নিয়ে সংশয় রয়েছে আমার। অথচ আমাদের মুক্তিযুদ্ধে তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি সংশ্লিষ্টতায় নজিরবিহীন, চেতনায় দীপ্ত আর বিজয়ে একাত্ম।

চাকরি শেষে ঢাকা থেকে অস্ট্রেলিয়া ফিরে এখানেই বসবাস করেন তিনি। মারিয়া জানায়, জন্ম হল্যান্ডে। শেষ নিবাস ক্যাঙারুর দেশে হলেও ওডারল্যান্ডের স্মৃতি, স্বপ্নে অন্য এক মাতৃভূমি বাংলাদেশ। আমাদের জাতীয় জীবনে বহু অনালোচিত ভুলে যাওয়া নক্ষত্রের মতো তিনিও একজন। তবে এটা সত্যি, তিনি নির্মোহ, সত্যের খাতিরে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবে অংশীদার হয়েছিলেন, ফলে ইতিহাসই তাকে ধরে রাখবে। যতদিন পদ্মা, মেঘনা, যমুনা বহমান থাকবে, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসির' উঠোনে ফুল ফুটবে ততদিন ওডারল্যান্ডকে মনে রাখবে বাংলাদেশ।

এবারের বিজয় দিবসেও চেতনার মুক্তি, স্বাধীনতার স্পৃহা, সাম্য ইত্যাদি নিয়ে অযুত লেখা পড়ব আমরা। তারপর ভুলে যাব। যথানিয়মে দিন গড়াবে। কেউ কি মনে করবেন এই বিদেশী মুক্তিযোদ্ধাকে, যিনি স্বপ্ন ও জাগরণে বাংলাদেশকে ভালোবাসেন, নিজেকে তার সন্তান মনে করতে চান?

ইতিহাসের স্বার্থে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাকে যেমন মনে রাখা জরুরি সম্মান জানানো পরম দায়িত্ব। মৃত্যুপথযাত্রী ওডারল্যান্ড বীরপ্রতীককে নাগরিকত্ব প্রদানের মাধ্যমে এটুকু পালন করা যেতে পারে। বুদ্ধিজীবী সংশ্লিষ্ট মহল কি এ নিয়ে ভাববেন? পাঠ্যপুস্তকে কি উঠে আসবে তার কথা? হোক তা ২৯ বছর পর।

সিডনি, ২৬ নভেম্বর ২০০০